॥ প্রথম অধ্যায় ॥

-: ভূ মি কা :-

(ক) গবেষণার বিষয় ও লক্ষ (Scope and Objectives of the Study) :

এই গবেষণা - প্রকল্পের বিষয় পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশের উত্তর - সীমান্তবর্তী জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষা। একটি প্রশাসনিক সংগঠনরূপে এই জেলার আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৮৬১ সালের ১লা জানুয়ারী, ইংরেজদের রাজত্ব কালে। রংপুর জেলার জলপাইগুড়ি মহকুমা এবং পশ্চিম ডুয়ার্সকে একসঙ্গে সংযুক্ত করে এই জেলাটি গঠিত হয়। প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসী - কোচ, মেচ, রাভা, গারো, ধিমাল, থারু, টোটো প্রভৃতি ইন্দো-মোঙ্গলীয় জাতিগুলি। ত্রয়োদশ শতাব্দিতে মুসলমান অভিযানের পর থেকে এই অঞ্চলে মুসলমান-সম্প্রদায়ের আগমণ ঘটতে শুরু করে। স্থানীয় লোকদের মধ্যেও কেউ কেউ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং চা-শিল্পের পত্তন ও বিকাশের সময় থেকে এই জেলায় দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাগম হতে থাকে। চা-বাগানগুলিতে শ্রমিকের কাজ করবার জন্য নেপালী এবং ছোটনাগপুর মানভূমি ও বৃহত্তর ঝাড়খণ্ড অঞ্চল থেকে প্রচুর সংখ্যক আদিবাসী শ্রমিক আমদানী করা হয়। এই সব আদিবাসী শ্রমিকরা প্রধানত কোল ও দ্রাবিড় গোষ্ঠী ভুক্ত জনজাতি। বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলার চা-শ্রমিকদের ৮০ ভাগই আদিবাসী এবং ২০ ভাগ নেপালী।[১] চা-বাগানগুলিতে প্রশাসনিক ও করণিকের চাকুরী এবং অন্যান্য জীবিকার সূত্রে বাংলার অন্যান্য জেলা থেকে বাঙালীদেরও আগমণ ঘটে এই জেলায়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় দেশবিভাগজনিত কারনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু এই জেলায় অভিবাসিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলা দেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ও বহু বাঙালী শরণার্থী এই জেলায় এসে উপস্থিত হন। বস্তুত স্বাধীনতা লাভের পর থেকে বৈধ ও অবৈধ ভাবে 'ওপার বাংলা' থেকে বাঙালী শরণার্থী আগমণের বিরাম নেই। এইভাবে প্রাচীন অধিবাসীদের সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আগত নানা জাতি ধর্ম ও

বর্ণের মানুষের সংমিশ্রণে জলপাইগুড়ি জেলায় গড়ে উঠেছে একটি মিশ্র বা 'সমন্বয় প্রাপ্ত' জনমণ্ডলী । ফলে বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় মোট অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক বহিরাগত ।

এই জেলার ভাষাগত পরিস্থিতিও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সহ-অবস্থানে অসাধারণ বৈচিত্র্য পূর্ণ । ১৯৬১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যান অনুসারে জলপাইগুড়ি জেলায় মাতৃ-ভাষার সংখ্যা ১৫০ টিরও বেশি । এই জেলার প্রাচীন অধিবাসী কোচ-মেচ-গারো টোটো প্রভৃতি ইন্দো-মোঙ্গলীয় জনগোষ্ঠীগুলির প্রত্যেকেরই নিজস্ব মাতৃভাষা আছে । তবে কোচজাতি পরবর্তীকালে নিজেদের ধর্ম ও ভাষা পরিত্যাগ করে হিন্দু ধর্ম ও বাংলা ভাষা গ্রহণ করে রাজবংশী জাতিতে পরিণত হয়েছেন । বর্তমানে এরা 'পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়' নামে নিজেদের পরিচয় দিয়ে থাকেন । রাজবংশীরাই এই জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠী এবং তাঁরা বাংলা ভাষার যে আঞ্চলিক রূপটি ব্যবহার করে থাকেন সাধারণ ভাবে তা রাজবংশী ভাষা নামে পরিচিত । গ্রীয়ারসনই সর্বপ্রথম এই আঞ্চলিক ভাষাটিকে 'রাজবংশী উপভাষা' নামে অভিহিত করেছিলেন[২]। পরবর্তী কালে ভাষাচার্য, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়[৩]। সুকুমার সেন[৪] প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ এই উপভাষার নামকরন করেছেন 'কামরূপ' ও 'কামরূপী' উপ ভাষা । কিন্তু উত্তরবঙ্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রাক্তন 'বিদ্যাসাগর অধ্যাপক' ডঃ হরিপদ চক্রবর্তী[৫], ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল[৬], ডঃ গিরিজাশংকর রায়[৭], সুধীর কুমার করণ[৮] প্রমুখ পন্ডিতরা নানা প্রসঙ্গে এই উপ ভাষা সম্পর্কে আলোচনায় 'রাজবংশী' অভিধাটিই ব্যবহার করেছেন । সাধারণভাবে স্থানীয় জনসাধারণের কাছে উপভাষাটি 'রাজবংশী ভাষা' বা 'রাজবংশী বুলি' নামেই সমধিক পরিচিত । জলপাইগুড়ি জেলায় মেচ, রাভা, গারো, টোটো প্রভৃতি ভোট-বর্মা ভাষাগুলির বাচকসংখ্যা খুব বেশি নয় । মেচ, রাভা ও গারোদের বৃহত্তর অংশই বাস করেন আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় । দীর্ঘকাল থেকে ভারতের মাটিতে বিবর্তন এবং অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষার প্রভাবে এই ভাষাগুলির বৈশিষ্ট্য অনেক বদলে গিয়েছে । ১৯২৭ সালে গ্রীয়ারসন এই ভাষাগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন — " .... the old Bodo languages are gradually

dying out. .... many of those Bodos who still adhere to there old form of speech are trilingual. Numbers of them can speak Assamese, and addition to this they commonly employ, not only there own pure racy agglutinating tongue, but also a curious compound mongrel made up a Bodo vocabulary expressed in the altogether alein idiom of Assamese." [১] আসামের বোড়ো ভাষীদের সম্পর্কে একথা বলা হলেও জলপাইগুড়ি জেলার বোড়ো ভাষাভাষীদের সম্পর্কেও গ্রীয়ারসনের মন্তব্যটি প্রযোজ্য। জলপাইগুড়ি জেলার মেচ ও রাভা ভাষাভাষীরা নিজেদের ভাষাগত স্বকীয়তা বজায় রাখতে সমর্থ হলেও, বাংলা ভাষার দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। কিন্তু টোটো ভাষায় বাংলা ভাষা থেকে নেপালী ভাষারই প্রভাব বেশি। কারণ টোটোদের বাসভূমি টোটোপাড়ায় এখন নেপালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। জলপাইগুড়ি জেলার চা-বাগানগুলিতে ভাষাগত বৈচিত্র্য অন্যান্য অঞ্চল থেকে বেশি। চা-বাগান অঞ্চলে নেপালী ও হিন্দী ভাষা দুটির বাচক সংখ্যা অন্যান্য ভাষা থেকে বেশি। তবে আদিবাসী শ্রমিকদের অনেকেই হিন্দী ভাষা জানেন। শতবর্ষ পূর্বে স্ব-ভূমি থেকে যখন বর্তমান আদিবাসী শ্রমিকদের পূর্ব পুরুষরা চা-বাগানগুলিতে এসেছিলেন, তখন তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন এবং অধিকাংশ গোষ্ঠীরই নিজস্ব মাতৃভাষা ছিল, কিন্তু এক গোষ্ঠীর ভাষার বোধগম্যতা অন্য গোষ্ঠীর কাছে ছিল না। তারফলে বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মধ্যে যোগাযোগের জন্য ক্রমশঃ একটি 'ঐক্য বিধায়ক' কথ্য ভাষা প্রচলিত হয়। সাধারণ ভাবে এই কথ্য ভাষাটি 'সাদ্রী' বা 'সাদানী' ভাষা নামে পরিচিত। বর্তমান প্রজন্মের আদিবাসী শ্রমিকরা অধিকাংশই নিজেদের পূর্বপুরুষদের ভাষা ভুলে গিয়েছেন, সাদরা ভাষাই হয়ে উঠেছে তাঁদের মাতৃভাষা। তাঁরা পূর্ববর্তী মাতৃভাষা অপেক্ষা সাদরী ভাষাতেই যেন বেশি স্বচ্ছন্দ। সাদরী ভাষা চা-বাগানগুলিতে উদ্ভূত একটি কাজ চালানো গোছের 'মিশ্র ভাষা', না, বিহার থেকে আনীত একটি বিশুদ্ধ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক আছে। আদিবাসী চা-শ্রমিকদের গোষ্ঠী ভাষাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য – অষ্ট্রিক গোষ্ঠীর, মুন্ডা,

সাঁওতালী , খারিয়া , শবর এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর কুরুখ্-ওঁরাও ভাষা । জলপাইগুড়ি জেলায় অভিবাসী বাঙালীরা এসেছেন প্রধানত বাঙালী ও বরেন্দ্রী উপভাষিক অঞ্চল থেকে। এঁরা নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে পূর্ববর্তী উপভাষা ব্যবহার করেন , কিন্তু বাইরের লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় কিংবা কর্মস্থলে চলিত-মৌখিক বাংলা ব্যবহার করেন । কিন্তু লক্ষণীয় যে , দেশ বিভাগের সময় যাঁরা শরণার্থী রূপে উপস্থিত হয়েছিলেন , তাঁরা পূর্ববর্তী উপভাষা যতটা ব্যবহার করতেন , তাঁদের উত্তর পুরুষ , বর্তমান প্রজন্মের বাঙালীরা ততটা সেই ভাষা ব্যবহার করেন না । এঁদের বাক্ ব্যবহারে চলিত-মৌখিক বাংলার প্রভাবই অধিকতর । শুধু বাঙালীরা নয় , অন্যান্য ভাষা-সম্প্রদায়ও কম-বেশি চলিত - মৌখিক বাংলা ভাষার দ্বারা প্রভাবিত । জীবিকা-সূত্রে জলপাইগুড়ি জেলায় রাজস্থানী , পাঞ্জাবী , গুজরাটী , ওড়িয়া , অসমীয়া , তামিল প্রভৃতি ভাষা-ভাষী কিছু লোকও বসবাস করেন । কিন্তু এরা অধিকাংশই অস্থায়ীভাবে এখানে বসবাস করেন । সুতরাং জলপাইগুড়ি জেলার ভাষিক পরিবেশ গড়ে উঠেছে বহুবিধ ভাষার সমবায়ে । কিন্তু সবগুলি ভাষার জনসংখ্যা ও ভৌগোলিক প্রসার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব সমান নয় ।

ভৌগোলিক বিস্তার এবং বাচক সংখ্যার দিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে রাজবংশী ও সাদরী ভাষা উল্লেখযোগ্য । নেপালী ভাষা-ভাষীরা অধিকাংশই পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলিতে বসবাস করেন । হিন্দী ভাষা-ভাষীদের অধিকাংশই এই জেলার স্থায়ী অধিবাসী নন্ । মেচ , রাভা , গারো , টোটো প্রভৃতি ভোট-বর্মী ভাষার বাচক সংখ্যা কম এবং ভাষাগুলির নিজস্ব লিপি বা লিখিত সাহিত্য নেই । বাংলা লিপির সাহায্যে মেচ ভাষীরা সাহিত্য চর্চায় উদ্যোগী হয়েছেন কেউ কেউ । এই সব ভাষা-ভাষী লোকেরা বাস করেন জলপাইগুড়ি জেলার পশ্চিম ডুয়ার্স অঞ্চলে তিস্তার পশ্চিম দিকে এঁদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না ।

আধুনিক সভ্যতা দ্রুত বাহু বিস্তার করছে শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, শিক্ষার বিস্তার, হাট বাজারের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার প্রবর্তন, ইত্যাদি কারণে গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও গণ্ডীবদ্ধ জীবন থেকে বেরিয়ে এসে গতিশীল আধুনিক জীবনযাত্রায় ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন। কিন্তু এই আধুনিক জীবনযাত্রাকে তাঁরা যত বেশি গ্রহণ করছেন, তত বেশি করে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও মাতৃভাষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। আধুনিক সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে চলিত-মৌখিক বাংলা গ্রাস করতে চলেছে অন্যান্য ভাষা-সম্প্রদায়গুলিকে। অ-বাঙালীরাও নিজেদের শিক্ষা ও জীবিকার প্রয়োজনে বাংলা ভাষা শিখতে বাধ্য হচ্ছেন। শিক্ষার মাধ্যম বাংলা ভাষা হওয়ায় অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়ের বিদ্যার্থীরা বাংলা ভাষায় শিক্ষা লাভ করছেন এবং তাদের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। লক্ষণীয় যে, অন্যান্য ভাষা-সম্প্রদায় বাংলা ভাষা শিখতে বাধ্য হলেও, বাংলা ভাষীদের অন্য কোন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে হচ্ছে না। তারফলে জলপাইগুড়ি জেলায় অনেকগুলি ভাষা সম্প্রদায় থাকলেও এবং বহুকাল ধরে কয়েকটি ভাষা-সম্প্রদায় নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখতে সমর্থ হলেও, সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষার প্রভাবে অন্যান্য ভাষা সম্প্রদায়গুলি ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। বাংলা ভাষার ক্রমাগত চাপের সামনে অন্যান্য ভাষা-সম্প্রদায়গুলির ভবিষ্যৎ অস্তিত্ব সম্পর্কেই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলি নিয়ে এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা ও গবেষণা হয় নি। এই জেলার কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে কয়েকটি যেমন ভোট-বর্মা ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তেমনি এমন ভাষা সম্প্রদায়ও আছে, যা অন্যত্র বিরল। এই কথ্য ভাষাগুলি যেভাবে দ্রুত অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে অদূর ভবিষ্যতে এইসব ভাষাগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহই দুরূহ হয়ে পড়বে। সেদিক থেকে বলা যায়, সম্পূর্ণভাবে নিজস্বতা হারাবার আগেই এই কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে গবেষণা প্রয়োজন। অধোপরি একটি জেলার মধ্যে অনেকগুলি ভাষা সম্প্রদায় দীর্ঘকাল থেকে পাশাপাশি অবস্থান করার ফলে পরস্পর পরস্পরের দ্বারা প্রভাবের ফলে যে

ভাষিক-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, সে-সম্পর্কেও সমীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে। এই অঞ্চলের ভাষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক গবেষণা এখনও যথেষ্ট নয়। জর্জ গ্রীয়ার্সন থেকে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বা আরও কেউ কেউ যে সব আলোচনা করেছেন, তা পর্যাপ্ত নয়। এই দিক থেকে বহু ভাষা-ভাষী জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনা নিঃসন্দেহে প্রয়োজনীয়। বস্তুত এই লক্ষ্য অঙ্গীকার করেই এই গবেষণা প্রকল্পের অভিষ্ট নির্ধারিত হয়েছে। এই গবেষণার উদ্দেশ্য জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যগঠন রীতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকভাবে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা।

এই গবেষণা প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষা সমূহের মধ্য থেকে পাঁচটি ভাষাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এই পাঁচটি কথ্য ভাষা হল – রাজবংশী কথ্য ভাষা, সাদরী ভাষা, মেচ ভাষা, রাভা ভাষা এবং টোটো ভাষা। এই পাঁচটি কথ্য ভাষাকে নির্বাচনের কারণ, রাজবংশী কথ্য ভাষাই জলপাইগুড়ি জেলার বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা, অন্যদিকে সাদরী ভাষা এই জেলার চা-বাগান অঞ্চলের প্রচলিত একটি ঐক্য বিধায়ক কথ্য ভাষা। নিজেদের মাতৃ ভাষা থাকা সত্ত্বেও চা-বাগান অঞ্চলের আদিবাসী চা-শ্রমিকরা সাদরী ভাষাকে যোগাযোগের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মেচ ও রাভা ভাষা, জলপাইগুড়ি জেলার প্রাচীন অধিবাসীদের মাতৃভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম। ভোট-বর্মী গোষ্ঠীর এই ভাষাগুলি আসামের কয়েকটি জেলায় প্রচলিত থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় নেই বললেই চলে। অবশ্য কোচবিহার ও দার্জিলিং জেলায় মেচ ও রাভাদের একটি ক্ষুদ্রাংশ বাস করেন। বাংলা ভাষার পরিমণ্ডলে এই ভাষাগুলির কি রকম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলার ভাষাতাত্ত্বিক সমীক্ষা থেকেই জানা সম্ভব। টোটো ভাষা একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হলেও এই ভাষাটির অস্তিত্ব অন্যত্র বিরল। সভ্য জগতের সংস্পর্শ এড়িয়ে দীর্ঘকাল ব্যাপী দুর্গম

পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্যে আবদ্ধ থাকার ফলে টোটোদের ভাষায় ভোট-বর্মী ভাষার বৈশিষ্ট্য-গুলি মোটামুটিভাবে অক্ষুন্ন আছে । সেদিক থেকে এই ভাষাটির বিশেষ ভাষাতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য ।

(খ) পূর্ববর্তী আলোচনা : (Survey of the previous Works) :

জেলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষা এবং ভাষিক-পরিস্থিতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ও ধারাবাহিক আলোচনার একান্ত অভাব লক্ষ করা যায় । এতদাঞ্চলের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় , সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কিছু কিছু গবেষণামূলক আলোচনা পাওয়া গেলেও ভাষা সম্পর্কিত আলোচনা খুব কমই পাওয়া যায় । জর্জ গ্রীয়ারসন , ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বা আরো কেউ কেউ যে সব আলোচনা করেছেন , তা যথেষ্ট নয় । রাজবংশী , মেচ , রাভা , সাদরী - প্রভৃতি ভাষাগুলি সম্পর্কে যে সব আলোচনা-গুলি হয়েছে , তা কোনো একটি বিশেষ জেলার কথ্য ভাষা হিসাবে নয় , সাধারণ ভাবে উক্ত ভাষাগুলির কোনো কোনো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় , সমাজ , সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল ইংরেজ রাজত্ব কালে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজরাই এইসব আলোচনায় অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন । ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার জন্যই ইংরেজরা এই দেশের জনসাধারণের জীবন , সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন । বিভিন্ন সেনসাস্ রিপোর্টে , সেটেলমেণ্ট রিপোর্টে , ভাষা-জরীপ রিপোর্টে এবং আরো অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজদের সংগৃহীত মূল্যবান তথ্যগুলি পাওয়া যায় । এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছে । এই সব তথ্য ও আলোচনাগুলি পরবর্তীকালের গবেষকদের কাছে আকর রূপে বিবেচিত

হয়েছে । ইংরেজ আমলে এতদাঞ্চলের বিভিন্ন কথ্যভাষাগুলি সম্পর্কে যে সব প্রবন্ধ নিবন্ধ এবং গ্রন্থাদি প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল ।

এতদাঞ্চলের কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য আলোচনা হিসাবে প্রথমেই নাম করা যায় ১৮৮০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত বি.এইচ. হজসনের 'মিসেলানিয়াস এসেস্' গ্রন্থটির । এই গ্রন্থে তিনি ৭১ পৃষ্ঠা ব্যাপী কোচ শব্দের একটি তালিকা প্রকাশ করেছেন । তিনি অবশ্য এই ভাষার ব্যাকরণ নিয়ে কোনো আলোচনা করেন নি । ইতিপূর্বেও তিনি ১৮৪৭ সালে 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল' (Vol. XVI) -এ 'সাব-হিমালয়ান ডায়লেকট্স' গুলির একটি তুলনামূলক শব্দ-কোষ প্রকাশ করেছিলেন[১০]। ১৮৭৭ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটির' জার্নালে (Vol. XL VI, Part-I, No.3) প্রকাশিত হয়েছিল জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসনের 'নোটস্ অন্ রঙ্পুর ডায়লেকটস্' নামে একটি মূল্যবান প্রবন্ধ । রাজবংশী উপ-ভাষা সম্পর্কে এটিই সম্ভবত 'প্রথম আলোচনা'[১১]। ১৮৯১ সালে 'আসাম সেনসাস রিপোর্টে (Vol.I, P-159-163) ই.এ. গেইট কাছারীভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন । ১৮৯৫ সালে ডি.এইচ. সাণ্ডার তাঁর 'সার্ভে এন্ড সেটেল্মেন্ট রিপোর্টে গারো, মেচ, টোটো, ভোটিয়া এবং রাজবংশী শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন এবং রাজবংশী ভাষার কিছু প্রবাদ-প্রবচন ও সংকলন করেছেন[১২]। ১৮৯৬ সালে রাচীর এস.জি.পি. মিশনের রেভারেন্ড এ.এইচ. হুইট্নি 'নোটস অন্ দি গাঁওয়ারী ডায়লেক্ট্ অফ লোহার ডাঙ্গা' নামে একটি ২১ পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রকাশ করেন । এই পুস্তিকাটিতে নাগপুরিয়া বা সাদানী ভাষার ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রূপরেখা অংকনের চেষ্টা করা হয়েছে । গ্রীয়ারসন তাঁর 'লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ্ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে নাগপুরিয়া বা সাদানী ভাষার রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় এই পুস্তিকাটির কাছে ঋণ স্বীকার

করেছেন[১৩]। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচী থেকে প্রকাশিত রেভারেন্ড কনরাড্ রুকাইট তাঁর 'গ্রামার অফ দি নাগপুরিয়া-সাদানী ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থে প্রথম দাবী করেন যে, এই কথ্য ভাষাটি ভোজপুরিয়ার বিভাষা (Sub-dialect) নয়, মৈথিলী ইত্যাদির মত বিহারী হিন্দীরই একটি উপভাষা। ১৯১২ সালে ফ্রেড্ পেরেইরা তাঁর 'দি রাভাস্ ইন্ দি সেন্সাস্ অফ আসাম' শীর্ষক রিপোর্টে রাভা ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন[১৪]। ১৯১১ সালে এস. এণ্ডেল তাঁর 'দি কাছারিস্' গ্রন্থে দারাং জেলার কাছারীদের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। জন এফ. গ্রুনিং সম্পাদিত 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এন্ড আসাম ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স : জলপাইগুড়ি', ১৯১১ গ্রন্থে রাজবংশীদের মৎস্য শিকারের বিভিন্ন সরঞ্জামের তালিকা চিত্রসহ প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষাগুলি সম্পর্কে সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করেছেন জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন তাঁর লিঙ্গুইষ্টিক সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' গ্রন্থমালার বিভিন্ন খণ্ডে। প্রধানত আঞ্চলিক সমীক্ষার উপর নির্ভর করেই গ্রীয়ারসন বিভিন্ন ভাষা ও উপ-ভাষাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থমালায় তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অংশে টোটো ভাষা, এবং দ্বিতীয় অংশে বোড়ো বা মেচ, রাভা, গারো প্রভৃতি বোড়ো গোষ্ঠীর তিব্বত-বর্মী ভাষাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম খণ্ডের প্রথম অংশে নাগপুরিয়া বা সাদানী উপভাষা এবং দ্বিতীয় অংশে বাংলা অসমীয়া ভাষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে রাজবংশী উপভাষা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গ্রীয়ারসনই সর্বপ্রথম ভারতীয় ভাষাগুলিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বর্গীকরণ করেছেন এবং বিভিন্ন ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে প্রসঙ্গত আলোচনা করেছেন। পরবর্তীকালে গ্রীয়ারসনের আলোচনার কিছু ত্রুটী ধরা পড়লেও ভারতীয় ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষার ও বিশ্লেষণের গুরুত্ব এখন পর্যন্ত মূল্যবান।

ইংরেজ গবেষকদের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন ভারতীয় পণ্ডিতও এতদাঞ্চলের বিভিন্ন কথ্য ভাষা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করেছেন। ১৯০৩ সালে প্রকাশিত

হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর 'দি কোচবিহার এন্ড ইটস্ ল্যান্ড রেভিনিউ সেটেল্‌মেন্ট' গ্রন্থটিতে রাজবংশী ভাষার কয়েকটি রূপতাত্ত্বিক সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (প্রথম সংখ্যা) প্রকাশিত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'রঙপুরের দেশীয় ভাষা' প্রবন্ধটি রাজবংশী ভাষা সম্পর্কে একটি মূল্যবান আলোচনা। প্রবন্ধকার রাজবংশী ভাষার উৎপত্তি, কারক বিভক্তি, সর্বনাম ইত্যাদি রূপতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের বর্ণনা সহ বিষয়ভিত্তিক শব্দতালিকাও উপস্থিত করেছেন। এই ধরনের আরো দুটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল - ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (চতুর্থ সংখ্যা) প্রকাশিত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশের 'কামতাবিহারী ভাষা সম্পর্কে যৎকিঞ্চিৎ' এবং ১৩২৫ বঙ্গাব্দে 'রঙপুর সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় (প্রথম-চতুর্থ সংখ্যা) যতীন্দ্রমোহন চৌধুরীর 'রঙপুর ভাষার ব্যাকরণ'। এই প্রবন্ধগুলির নামকরন থেকে বোঝা যায় যে, তখন পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষাটির কোনো নির্দিষ্ট নামকরন প্রচলিত হয় নি।

স্বাধীনতাত্তোর কালে বিভিন্ন উপভাষা ও উপজাতিদের মাতৃভাষা রূপে ব্যবহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভাষাগুলি নিয়ে গবেষকদের আগ্রহ বাড়লেও, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী উপভাষা এবং মেচ, রাভা, টোটো প্রভৃতি ভাষা সম্পর্কে গবেষণামূলক কাজ সন্তোষ-জনক নয়। এই পর্বে উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৩৬১ সালে প্রকাশিত উপেন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস' গ্রন্থের 'ভাষাখন্ড'-এ রাজবংশী কথ্য ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থের লেখক রাজবংশীকে একটি স্বতন্ত্র ভাষা হিসাবে দাবী করেছেন। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীজ্ অফ নর্থবেঙ্গল' গ্রন্থের দ্বাদশ খন্ডে রাজবংশী উপভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা স্থান লাভ করেছে। ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত ডঃ নির্মল দাসের

'উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে' গ্রন্থটি রাজবংশী উপভাষা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই পূর্ববর্তী কালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটিতে সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের ভাষা- পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে স্থানীয় উপভাষাটির নামকরন, ঐতিহাসিক গুরুত্ব এবং কুচবিহারবাসিনী রাজবংশী রমনীদের বাক্ ব্যবহারের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। রাজবংশী উপভাষা সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত আর একটি উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ ড: নির্মলেন্দু ভৌমিকের 'প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা'(১৯৮৫)। এই গ্রন্থটিতে বর্ণনামূলক ভাষা-বিজ্ঞানের বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরন করে উপভাষাটির ধ্বনিতত্ত্ব, ধ্বনিপরিবর্তন, রূপতত্ত্ব এবং শব্দ-ভান্ডার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ড: ভৌমিক উপভাষাটির নামকরন প্রসঙ্গে নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন এবং ভাষাগত দিক থেকে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যগুলির বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জলপাইগুড়ি জেলাকে এই উপভাষাটির 'কেন্দ্র-ভূমি' রূপে উল্লেখ করেছেন। ১৯৮৮ সালে প্রকাশিত সুভাষচন্দ্র রায়চৌধুরীর 'পশ্চিম দিনাজপুরের উপভাষা' নামক গবেষণামূলক গ্রন্থটিতে পশ্চিম দিনাজপুর জেলার রাজবংশী উপভাষা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ড: গিরিজা শংকর রায়ের 'প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ' প্রথম খন্ডে (১৩৮৮) রাজবংশী কথ্য ভাষার- ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার সঙ্গে সংস্কৃত-জাত কিছু রাজবংশী শব্দের তালিকাও দেওয়া হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ বর্মনের 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্য ভাষা' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পি.এইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য অনুমোদিত হলেও এখনও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। এই গবেষণাপত্রে কোচবিহার জেলার রাজবংশী কথ্য ভাষা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে এবং অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশী ভাষার সঙ্গে কোচবিহারের কথ্য ভাষার ধ্বনিগত ও রূপগত পার্থক্য দেখানো হয়েছে। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ও.ডি.বি.এল. গ্রন্থের

প্রথম খণ্ডে বাংলা ভাষার উপভাষাগুলি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। সুকুমার সেনের ভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থেও উত্তরবঙ্গের উপভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান লাভ করেছে।

মেচ ও রাভা ভাষা সম্পর্কে অধিকাংশ আলোচনাই আসাম-কেন্দ্রিক। জলপাইগুড়ি জেলার মেচ ও রাভা ভাষা সম্পর্কে প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের সংখ্যা খুবই কম। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি মেচেস্ এন্ড টোটোস্ অফ নর্থ বেঙ্গল' (১৯৭৩) গ্রন্থের 'দি মেচেস' অংশের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার 'মেচ ভাষার' সংখ্যাশব্দ, শব্দভাণ্ডার এবং কয়েকটি নির্বাচিত ভাষা নিদর্শন সংযোজিত হয়েছে। মেচ বা বোড়ো ভাষা সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ হল গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত ডঃ প্রমোদচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'এ ডেস্ক্রিপ্টিভ্ এ্যানালাইসিস্ অফ বোড়ো ল্যাঙ্গুয়েজ' গ্রন্থটি। গ্রন্থটিতে আসামের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার বোড়োদের ভাষা সম্পর্কে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে। এই গ্রন্থটিতে প্রচুর দৃষ্টান্ত সহ বোড়ো ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব এবং রূপতত্ত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ইংরাজী অর্থসহ বোড়ো শব্দের একটি দীর্ঘ তালিকাও সংযোজিত হয়েছে। গৌহাটী থেকেই প্রকাশিত ভবেন নার্জীর 'বড়ো আও' (বোড়ো ভাষা) গ্রন্থটিতে (১৯৯০) প্রথাগত ব্যাকরণের রীতি অনুসারে বোড়ো ভাষার স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির উচ্চারণ গত বৈশিষ্ট্য এবং ব্যাকরণের সূত্রগুলি আলোচিত হয়েছে।

রাভা ভাষা সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের উল্লেখযোগ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ হল, আসামের বিনাসীপাড়া থেকে প্রকাশিত ডঃ রেবতী মোহন সাহার "বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনা প্রসঙ্গে কোচ-রাভা ভাষা"(১৯৮১) গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটিতে কোচ ও রাভা জাতিকে অভিন্ন জাতি বলে দাবী করে, তাদের ভাষাকে 'কোচ-রাভা' ভাষা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এখানে বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে কোচ-রাভা ভাষার

ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 'ওয়েষ্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট সেনসাস্ হ্যান্ডবুক ; জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট - ১৯৬১' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শ্যামাপদ দত্তের 'দি রাভা স্পিচ্' নিবন্ধটি জলপাইগুড়ি জেলার রাভা ভাষা সম্পর্কে একটি উল্লেখযোগ্য ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনা। নিবন্ধটিতে সংক্ষেপে রাভা ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত এবং বাক্যগঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত শব্দভান্ডার এবং ১৬৫টি রাভা বাক্য (ইংরাজী তর্জমা সহ) সংযোজিত হয়েছে। ১৯৮২ সালে 'অনার্য পত্রিকা' - র বাৎসরিক সংখ্যায় সুনীল পালের "রাভা ভাষার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা" প্রবন্ধটিতে জলপাইগুড়ি জেলার রাভা ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রূপ রেখা অংকনের চেষ্টা করা হয়েছে।

টোটোদের ভাষা সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনাই হয় নি। সান্ডার্স তাঁর সেটেলমেন্ট রিপোর্টে অন্যান্য কয়েকটি ভাষার সঙ্গে টোটো শব্দের একটি তালিকা দিয়েছিলেন। গ্রীয়ারসন টোটো ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন মাত্র আট পৃষ্ঠা। তিনি টোটো ভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে কয়েকটি প্রসঙ্গ সংক্ষেপে আলোচনা করে চার পৃষ্ঠা ব্যাপী নেওয়ারী, পাহাড়ো, রং ইত্যাদি ভাষার সঙ্গে টোটো শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর 'দি মেচেস্ এন্ড দি টোটোস্' গ্রন্থের 'দি টোটোস্' অংশের পঞ্চম অধ্যায়ে টোটো ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এই গ্রন্থে টোটোভাষার উৎসগত পরিচয়, সংখ্যাশব্দ এবং ব্যাকরণের কয়েকটি প্রসঙ্গ এবং নির্বাচিত শব্দের একটি তালিকা দিয়েছেন। অমল কুমার দাস তাঁর 'দি টোটোস' (১৯৬১) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ে টোটোদের ভাষাকে 'উপভাষা' বলে উল্লেখ করেছেন এবং কিছু টোটো শব্দের তালিকা উপস্থিত করেছেন। বিমলেন্দু মজুমদারের 'এ সোসিওলজিক্যাল স্টাডি অফ টোটো ফোক্ টেলস্' (১৯৯০) গ্রন্থে টোটো ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনায় এই ভাষার কয়েকটি ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সাদরী বা সাদানি ভাষা সম্পর্কে গবেষণামূলক আলোচনাও খুব কম। রেভারেন্ড হুইট্‌নী এবং রেভারেন্ড বুকাউটের পর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে রাঁচীর ক্যাথলিক মিশনের রেভারেন্ড হেনরিক ফ্লোর 'ল্যাঙ্গুয়েজ হ্যান্ডবুক, সাদানী' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। আসামের চা-বাগানগুলির ইংরেজ মালিক ও উচ্চ পদস্থ কর্মচারীদের সহজে সাদানী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়েছিল। সাদরী ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সমূহের উচ্চারণ, পদ পরিচয় এবং শব্দ ভাণ্ডার এই গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয়। সাদরী ভাষার উল্লেখযোগ্য ব্যাকরণটি ১৯৫৬ সালে রচনা করেন রাঁচীর পিটার শান্তি নওরোঙ্গী। তাঁর 'এ সিম্পল সাদানী গ্রামার' গ্রন্থটিতে বিজ্ঞান সম্মতভাবে সাদানী ভাষার ব্যাকরণ রচনার চেষ্টা লক্ষ করা যায়। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উচ্চারণ গত দিক থেকে সাদরী ভাষার সঙ্গে অবধী, ভোজপুরী, মাগধী প্রভৃতি ভাষার সাদৃশ্য থাকলেও বাক্য গঠন রীতির দিক থেকে এই ভাষা বাংলা ও ওড়িয়া ভাষার নিকটবর্তী। এই গ্রন্থে সাদানী ভাষাকে ছোট নাগপুর অঞ্চলের অন্যতম কথ্য ভাষা (Lingua - Franca) হিসাবেও দাবী করা হয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চলের 'সাদানী' ভাষা সম্পর্কে শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'সাদানী: দি ট্রাইবাল ডায়লেক্ট্ অফ সুন্দরবনস',[১৫] প্রবন্ধটিতে এই ভাষার কয়েকটি ধ্বনিগত ও রূপগত বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৩৯৬ বঙ্গাব্দে বালুরঘাট থেকে প্রকাশিত 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় (২০শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) লিখিত "আদিবাসী চা-শ্রমিকের ভাষা সাদরী", শীর্ষক প্রবন্ধে ড: সমীর চক্রবর্তী এই ভাষাকে বাংলা ভাষার ভগ্নী স্থানীয় একটি 'আর্যমূল ভাষা' বলে দাবী করেছেন। এই গবেষকেরই 'উত্তরবঙ্গের আদিবাসী চা-শ্রমিকদের সমাজ ও সংস্কৃতি' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থটিতে (১৯৯২) সাদরী ভাষায় উদ্ধৃত গান ও মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে সাদরী ভাষার উপাদান পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে উত্তরবঙ্গের কথ্য ভাষাগুলির শব্দ সংকলনরূপে কয়েকটি অভিধান জাতীয় গ্রন্থও সংকলিত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৯৭১ সালে

শিলিগুড়ি থেকে প্রকাশিত ফনীন্দ্রনাথ বর্মনের 'রাজবংশী অভিধান', আসামের কোক্রাঝাড় থেকে প্রকাশিত মনিরাম মোচারির 'বোড়ো-ইংলিশ্ ডিক্‌শেনারী' (১৯৮৫), এবং আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের 'ডুয়ার্সের লোকায়ত শব্দকোষ' প্রথম পর্ব (১৯৯০) গ্রন্থগুলি। কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্যের শব্দকোষটিতে ইংরাজী, হিন্দী ও বাংলা শব্দের সঙ্গে রাজবংশী, বোড়ো, সাদরী, রাভা ও সাঁওতালী ভাষার ১১00 টি করে শব্দ সংকলিত হয়েছে। এই জাতীয় অভিধান বা কোষগ্রন্থগুলি সম্পূর্ণ ত্রুটীমুক্ত না হলেও এতদাঞ্চলের কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজনীয় আকর গ্রন্থ হিসাবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য।

এ. এম. কুশারী এবং আরও অনেকে সম্পাদিত 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার্স' - জলপাইগুড়ি - ১৯৮১ গ্রন্থে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন কথ্য ভাষা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সংযোজিত হয়েছে। অমলকুমার দাশ তাঁর 'ল্যাঙ্গুয়েজেস্ অফ্ দি ট্রাইবস্ অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল' শীর্ষক নিবন্ধে[১৬] পশ্চিমবঙ্গের যে সব উপজাতির ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই জলপাইগুড়ি জেলার অধিবাসী। নিবন্ধটিতে প্রধানত মোঙ্গলীয়, কোল ও দ্রাবিড় জাতির বিভিন্ন উপজাতির মাতৃভাষাগুলির উৎসগত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার একান্ত অভাব রয়েছে। সামগ্রিকভাবে উত্তরবঙ্গের উপভাষা হিসাবে রাজবংশী কথ্য ভাষা সম্পর্কে কয়েকটি গবেষণা-সম্পাদিত হলেও, এই ভাষার 'কেন্দ্রভূমি' জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষা রূপে এই ভাষার আলোচনা হয় নি। মেচ ও রাভা ভাষা সম্পর্কে যে আলোচনাগুলি হয়েছে, তা প্রধানত আসামের মেচ ও রাভা উপজাতির মাতৃভাষা সম্পর্কে। জলপাইগুড়ি জেলার মেচ ও রাভা ভাষা সম্পর্কে পৃথক ভাবে কোনো আলোচনা হয় নি। অথচ বাংলা ভাষার

1 1 1041
2 9 APR 1994

পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করার ফলে জলপাইগুড়ি জেলায় এই ভাষা দুটিতে যে পরিবর্তন ঘটেছে, তারফলে আসামের মেচ ও রাভা ভাষার সঙ্গে কিছু কিছু পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম চা উৎপাদক জেলা, এবং এই জেলার চা-বাগানগুলিতে আদিবাসী শ্রমিকদের প্রধান কথ্য ভাষা রূপে 'সাদরী' ভাষা প্রচলিত। কিন্তু বিপুল সংখ্যক আদিবাসী শ্রমিকশ্রেণীর এই কথ্য ভাষাটি সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো ধারাবাহিক সমীক্ষা ও গবেষণা হয় নি। এই ভাষাটি সম্পর্কে যে দু-একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে রচিত নয়। বিরল উপজাতি টোটোদের ভাষা-সম্পর্কে এ যাবৎ কোনো গবেষকই আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। টোটোদের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে ডা: চারুচন্দ্র সান্যাল এবং অন্যান্য দু-একজন টোটো ভাষা সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, তাতে এই ভাষার সামগ্রিক রূপ ও ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় সুস্পষ্ট হয় নি। এদিক থেকে জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার ব্যাপক সুযোগ ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে হয়।

(গ) <u>গবেষণা-পদ্ধতি ও উপস্থাপনা (Methodology)</u> :

প্রধানত ক্ষেত্র-সমীক্ষার মাধ্যমে গৃহীত উপাদান-সংগ্রহের উপর ভিত্তি করেই এই গবেষণা-প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। তবে পূর্ববর্তী গবেষণা, জনগণনার রিপোর্ট ও পরিসংখ্যান, সরকারী নথিপত্র থেকেও প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ভাষা-ভাষী অঞ্চল থেকে সাধারণত এমন সব গ্রাম থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যেখানে বাইরের প্রভাব কম এবং জনজীবন মোটামুটি ভাবে স্থিতিশীল (Sedentary)। প্রত্যেক অঞ্চল

থেকে একজন করে তথ্য-সরবরাহক (Informant) নির্বাচন করে, তাদের মাধ্যমে যথাসম্ভব স্বাভাবিক কথোপথন - সূত্রে বিভিন্ন কথ্য ভাষা সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্যাদি টেপ রেকর্ডারে গ্রহন করা হয়েছে। অনেক সময় সরাসরি লিখে নিয়েও তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় সাধারণ লোকের কাছ থেকেও 'প্রাথমিক তথ্য' সংগৃহীত হয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকসময় চিত্র এবং বিভিন্ন বস্তুর সাহায্যও নেওয়া হয়েছে। ক্ষেত্র-সমীক্ষার সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে যাতে সংশ্লিষ্ট কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক, রূপতাত্ত্বিক এবং বাক্যগঠনের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি যথাসম্ভব নিখুঁত ভাবে গ্রহন করা যায়। প্রবীন ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেও কথ্য ভাষাগুলি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। ১৯৮৭ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষার মাধ্যমে বর্তমান গবেষণা-প্রকল্পের জন্য উপকরন সংগ্রহ করা হয়েছে। কথ্য ভাষাগুলিতে লভ্য লিখিত সাহিত্য এবং লোকসাহিত্য থেকেও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। রাভা ও মেচ ভাষা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে এবং ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে, দুবার আসামের গোয়ালপাড়া, কোকড়াঝাড়, বিলাসীপাড়া, কামরূপ প্রভৃতি স্থানে গিয়ে ভাষা সমীক্ষা করা হয়েছে।

বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপকরণগুলিকে বিধিবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করে কথ্য ভাষাগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে "এককালিক" (Synchronic) এবং "বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের" (Descriptive Linguistics) পদ্ধতি অনুসারে। বর্তমান গবেষণা-প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলার কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বাক্যগঠনরীতিতে প্রধানত পদক্রমের (Word-order) বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শব্দার্থতত্ত্বকে গবেষণা-প্রকল্পের

অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। শব্দভাণ্ডারের আলোচনায় কথ্য ভাষাগুলিকে বুৎপত্তিগতভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত না করে সাধারণভাবে সামাজিক ও নৈসর্গিক বিষয়-ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাস করা হয়েছে এবং বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে অন্যান্য কথ্য-ভাষাগুলির নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারিক রূপ প্রদত্ত হয়েছে।

বর্তমান গবেষণা পত্রে উত্তর বঙ্গের আঞ্চলিক উপভাষার নামকরণ সম্পর্কে বিতর্কে প্রবেশ না করে সাধারণভাবে এই উপভাষাটিকে 'রাজবংশী কথ্য ভাষা' নামে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ পণ্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক থাকলেও স্থানীয় জনসাধারণের কাছে এই উপভাষাটি 'রাজবংশী বুলি' বা রাজবংশী ভাষা নামেই সমধিক পরিচিত।

গবেষণা প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত পাঁচটি কথ্য ভাষা সম্পর্কে আলোচনা পৃথক পৃথক ভাবে করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে পাঁচটি ভাষা সম্পর্কে আলোচনা পৃথকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। পাঁচটি কথ্য ভাষা-সম্পর্কে ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার জন্য আলোচনাকে অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট করতে হয়েছে। গবেষণা পত্রের আকার বৃদ্ধির আশংকায় কোনো কোনো প্রসঙ্গকে আলোচনার বাইরেও রাখতে হয়েছে।

গবেষণা প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কথ্য ভাষাগুলির শব্দ ও বাক্যগুলি অনেকের কাছে দুর্বোধ্য হতে পারে বিবেচনায় প্রতিটি শব্দ ও বাক্যের অর্থ চলিত বাংলায় দেওয়া হয়েছে। অর্থগুলিকে প্রথম বন্ধনীভুক্ত করে মূল শব্দ বা বাক্যের পাশে অথবা নিচে রাখা হয়েছে।

কথ্য ভাষাগুলির প্রতিটি ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যাতে সুস্পষ্টতা লাভ করে, সেজন্য সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলি থেকে যথাসম্ভব বেশি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। তবে গবেষণা-পত্রের আকার বৃদ্ধির আশংকায় অনেকক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টকরণের প্রয়োজন হয়েছে।

টাইপের অসুবিধার জন্য কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনি-প্রতীক নির্দেশে 'আন্তর্জাতিক ধ্বনি মূলক বর্ণমালা' (IPA) ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে হয়েছে। তারফলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কথ্য ভাষাগুলির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যকে নিখুঁত ভাবে তুলে ধরা হয়ত সম্ভব হয় নি। প্রত্যেকটি ভাষারই নিজস্ব উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য থাকে, অন্য ভাষার ধ্বনি লিপির মাধ্যমে নির্ভুলভাবে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। তবুও বাংলা ভাষার লিপির মাধ্যমে কথ্য ভাষাগুলির উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে অক্ষুন্ন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণা পত্রে বিভিন্ন ভাষা ও উপ ভাষার বাচক সংখ্যা এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানগুলি গৃহীত হয়েছে, ১৯৭১ সালে জনগণনা থেকে। কারণ ১৯৮১ সালের জনগণনায় ভাষা, জাতি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক পরিসংখ্যানগুলি পরিহার করা হয়েছে এবং ১৯৯১ সালের জনগণনার পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এখনও প্রকাশিত হয় নি।

বর্তমান গবেষণা-পত্রটিকে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। বর্তমান ভূমিকাটি ছাড়াও অন্যান্য আটটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে সমগ্র আলোচনাটি যেভাবে অগ্রসর হয়েছে, সে সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া যেতে পারে।

গবেষণা-পত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইতিহাস, জেলার নামকরণ ও জনবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত এই জেলার কয়েকটি উপজাতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন ভাষা-সম্প্রদায়গুলির বিবরণ ও ভাষিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলাকে

একাধিক 'ভাষাগত অঞ্চলে' বিন্যস্ত করে অঞ্চলগুলির মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে কথ্য ভাষাগুলির ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনি তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বিভাজ্যধ্বনি (Segmental Sounds) এবং অবিভাজ্য ধ্বনি (Supra-Segmental Sounds) সমূহের বর্ণনা পৃথকভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। বিভাজ্য ধ্বনিগুলিকে উচ্চারণ গত ও প্রকৃতি গত বৈশিষ্ট্য অনুসারে শ্রেণীবিন্যস্ত করা হয়েছে। ন্যূনতম শব্দ জোড়ের (Minimal pair) সাহায্যে ধ্বনিমূল বা স্বনিম (Phoneme) নির্ণয়, সাধারণভাবে ধ্বনিগুলির অবস্থান (Distribution) এবং ধ্বনি সমাবেশের (Combination) বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অবিভাজ্য ধ্বনির আলোচনায় শ্বাসাঘাত, স্বরাঘাত, স্বর-তরঙ্গ (Intonation) যতি (Juncture) ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কথ্য ভাষাগুলির রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক আলোচনায় বিভিন্ন প্রকার রূপমূলের (Morpheme) শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে তাদের ব্যবহার (Function) অনুসারে, অর্থানুসারে নয়। ব্যাকরণিক সংবর্তগুলির (Grammatic Categories) প্রভাবে নামপদ ও ক্রিয়াপদের গঠনগত পরিবর্তন সম্পর্কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক আলোচনা বিন্যস্ত হয়েছে – শব্দ গঠন, নাম পর্যায়, ক্রিয়া পর্যায় এবং অব্যয় পর্যায়, — এই চারটি পর্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে বাক্যরীতির (Syntax) আলোচনায় কথ্য ভাষাগুলির বাক্যগঠনে পদ-বিন্যাস-ক্রমের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে কথ্য ভাষাগুলির নির্বাচিত শব্দ-ভাণ্ডার প্রদত্ত হয়েছে। শব্দগুলি নির্বাচিত হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে।

বাংলা ভাষার সঙ্গে তুলনাপ্রসঙ্গে কথ্য ভাষাগুলির নির্বাচিত শব্দের ব্যবহারিক রূপ দেখানো হয়েছে ।

অষ্টম অধ্যায়ে গবেষণা-প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে তুলনা মূলক আলোচনা করা হয়েছে । উৎসগত সম্পর্ক এবং ভাষা-সংশ্রবের ফলে কথ্য ভাষাগুলির মধ্যে যে ধ্বনিগত, শব্দগত, রূপগত এবং বাক্য গঠনগত সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে ।

পরিশেষে নবম অধ্যায়ে পূর্বাপরতা সূত্রে জলপাইগুড়ি জেলার কথ্যভাষাগুলির সাম্প্রতিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এবং প্রসঙ্গত কথ্য ভাষাগুলির ভবিষ্যৎ - সম্ভাবনা সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে ।

গবেষণা-পত্রের শেষে তিনটি পরিশিষ্ট অংশ সংযোজিত হয়েছে । পরিশিষ্ট - ১-এ জলপাইগুড়ি জেলার আলোচ্য পাঁচটি কথ্যভাষার নির্বাচিত নিদর্শন, পরিশিষ্ট - ২-এ কথ্য ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত সংখ্যা শব্দের তালিকা, এবং পরিশিষ্ট - ৩-এ বর্তমান গবেষণা-কর্মে তথ্য-পরবরাহক রূপে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা সংযুক্ত হয়েছে ।

-: নির্দেশিকা (References) :-

১। Bhowmic, S. : 'Recruitment and Migration policy in Tea Plantations in West Bengal', Das, A.K. and others (edited), 'West Bengal Tribes', Calcutta, C.R.I., S.C., S.T. Welfare Dept. Govt. of West Bengal Sp. No.35, 1991, P - 522.

২। Grierson, G.A. : Linguistic Survey of India, Reprint, Delhi, Motilal Banarasidas, 1967, Vol. - I, Part - I, P. - 153.

৩। Chatterjee, S.K. : Origin and Development of Bengali Language, Reprint, Calcutta, Rapa, 1979, Vol. - I, P. - 136.

৪। সেন, সুকুমার : ভাষার ইতিবৃত্ত, (১৩দশ সং), কলিকাতা, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, ১৯৭১, পৃ: - ১৬৪।

৫। চক্রবর্তী, হরিপদ, : 'উপভাষা প্রসঙ্গে', দত্ত রায় সুরঞ্জন ও রায় গিরিজাশংকর (সম্পা), 'লোকশিল্প', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৭৪।

৬। Sanyal, C.C. : The Rajbansis of North Bengal, Calcutta, The Asiatic Society, 1965, P. - 250.

৭। রায়, গিরিজাশংকর, : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ : লোক সাহিত্য, ১ম খন্ড, আলিপুরদুয়ার, ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ, পৃ - ৩।

৮। করণ, সুধীর কুমার, : 'রাজবংশী' লোকভাষা ও 'দক্ষিণ-পশ্চিমী বাঙলা', অজিতেশ ভট্টাচার্য (সম্পা), মধুপর্ণা, বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ সংখ্যা, একাদশ বর্ষ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৪, পৃ - ৪১-৪৭।

৯। Grierson, G.A. : Op. Cit, P. - 62.

১০। Grierson, G.A. : Op. Cit, P. - 13.

১১। ভৌমিক, নির্মলেন্দু, : প্রাক্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৫, পৃ: - ৪৪।

৯২। Sunder, D.H.E. : Survey and Settlement of the Western Doors in the district of Jalpaiguri— 1889 - 1895, Calcutta, Bengal Secretariate, 1895, Appendix-VI, P. XVIII to XXII.

৯৩। Grierson, G.A. : OP. Cit, Vol. - V, Part - I, P. - 278.

৯৪। Friend Periera, J.E. : The Rabhas in census of Assam, 1911, Vol. - III, Part - I, Cal - 1912.

৯৫। Mukherjee, S.N. : Sadani : The Tribal dialects of Sundarban , Calcutta, C.R.I. Bulletin. S.C. and S.T. Welfare Dept. Govt. of W.B., Vol. - III, No.2, 1964, P. 47-50

৯৬। Das, A.K. and others (edited), : West Bengal Tribes, Calcutta, C.R.I., S.C. and S.T. Welfare Dept. Govt. of W.B., Sp.No.35, 1991, P. - 232 - 241.

—o—